মহানবী (দ:) নূর

মূল: শায়খ হিশাম কাব্বানী (যুক্তরাষ্ট্র)
সংকলনকারী: ড: জি, এফ, হাদ্দাদ দামেশ্কী
অনুবাদ: কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

কুরআন মজীদের ৩টি স্থানে মহানবী (দ:)-কে 'নূর' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহতা'লা এরশাদ ফরমান:
"**কাদ জায়াকুম মিনাল্লাহে নূরুন ওয়া কিতাবুম্ মুবীন**" (৫:১৫)।

অর্থ: "নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নূর (আলো, জ্যোতি) এবং স্পষ্ট কেতাব (আল্ কুরআন)।"

ইমাম কাজী আয়ায (রহ:) বলেন, "মহানবী (দ:)-কে 'নূর' বলা হয়েছে তাঁর (নবুয়্যতের) স্বচ্ছতার কারণে এবং এই বাস্তবতার আলোকে যে তাঁর নবুয়্যতকে প্রকাশ্য করা হয়েছে; আর এই কারণেও যে তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা দ্বারা ঈমানদার (বিশ্বাসী) ও আল্লাহর আরেফ (খোদা সম্পর্কে জ্ঞানী)-দের অন্তরগুলো আলোকিত হয়েছে।"

ইমাম জালালউদ্দীন সৈয়ুতী (রহ:) তাঁর 'তাফসীরে জালালাইন' গ্রন্থে, ফায়রুযাবাদী 'তাফসীরে ইবনে আব্বাস' অবলম্বনে নিজ 'তানউইরুল মেকবাস' পুস্তকে (পৃষ্ঠা ৭২), শায়খুল ইসলাম ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, যিনি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ, তিনি তাঁর 'তাফসীরে কবীর' কেতাবে (১১:১৮৯), ইমাম কাজী বায়দাবী (রহ:) নিজ 'আনওয়ারুত্ তানযিল' শীর্ষক বইয়ে, আল বাগাভী তাঁর 'মা'আলিমুত্ তানযিল' নামের তাফসীর কেতাবে (২:২৩), ইমাম শিরবিনী নিজ 'সিরাজুম মুনীর' শীর্ষক তাফসীর গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩৬০), 'তাফসীরে আবি সা'উদ' (৪:৩৬) প্রণেতা এবং সানাউল্লাহ পানিপথী তাঁর 'তাফসীরে মাযহারী' (৩:৬৭) কেতাবে বলেন, "(আয়াতোক্ত) 'নূর' বলতে মহানবী (দ:)-কে বোঝানো হয়েছে।"

ইবনে জারির তাবারী তাঁর 'তাফসীরে জামেউল বয়ান' (৬:৯২) পুস্তকে বলেন, "তোমাদের কাছে

এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর (আলো) - এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ বোঝাচ্ছেন বিশ্বনবী (দ:)-কে, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ সত্য উদ্ভাসিত করেছেন, দ্বীন ইসলামকে প্রকাশ করেছেন, এবং মূর্তি পূজা নিশ্চিহ্ন করেছেন। অতএব, তিনি 'নূর', তাঁর দ্বারা যারা আলোকিত হয়েছেন তাদের জন্যে এবং সত্য প্রকাশিত হওয়ার জন্যে।"

আল খাযিন নিজ তাফসীর কেতাবে একইভাবে বলেন, "(আয়াতে) 'নূর' বলতে রাসূলে পাক (দ:)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর অন্য কোনো কারণে নয়, শুধু (এ কারণে যে) মানুষেরা তাঁর দ্বারা পথপ্রদর্শিত হন, যেমনিভাবে কেউ আলো দ্বারা অন্ধকারে পথের দিশা পান।'

ইমাম নাসাফী তাঁর 'তাফসীরে মাদারেক' (১:২৭৬) গ্রন্থে এবং আল কাসেমী নিজ 'মাহাসিন আল্ তা'বিল' (৬:১৯২১) পুস্তকে অনুরূপভাবে বলেন, "আয়াতে উল্লেখিত 'নূর' (জ্যোতি) হুযূর পূর নূর (দ:)-এর; কেননা, তাঁর দ্বারা-ই মানুষেরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হন। একইভাবে, তাঁকে 'সিরাজ' (প্রদীপ)-ও বলা হয়েছে (আয়াতে)।"

ইমাম আহমদ সাবী (রহ:) 'তাফসীরে জালালাইন' (১:২৫৮)-এর ওপর তাঁর কৃত চমৎকার ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে অনুরূপভাবে বলেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছেন এক নূর (আলো); ওই নূর হলেন মহানবী (দ:)। তাঁকে 'নূর' বলা হয়েছে, কারণ তিনি দৃষ্টিশক্তিকে আলোকিত করেন এবং সেটিকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন; আর এ কারণেও তা বলা হয়েছে, কেননা বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক সকল আলো/জ্যোতির মূল হলেন তিনি।" আমরা শেষ বাক্যটি সম্পর্কে পরে আবার আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

সৈয়দ মাহমুদ আলুসী নিজ "তাফসীরে রুহুল মা'আনী' শীর্ষক কেতাবে (৬:৯৭) একইভাবে বলেন, "আয়াতোক্ত 'নূর' বলতে মহৌজ্জ্বল আলো বুঝিয়েছে, যা সকল আলোর আলো এবং সকল আম্বিয়া (আ:)-এর মাঝে সেরা নবী (দ:)।"

ইসমাঈল হাক্কী (রহ:) আলুসীর তাফসীরের ব্যাখ্যামূলক কেতাব 'তাফসীরে রূহুল বয়ান' (২:৩৭০)-এ অনুরূপভাবে বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছেন এক নূর এবং সুস্পষ্ট একখানা কেতাব; এ কথা বলা হয় যে 'নূর' বলতে মহানবী (দ:)-কে বোঝানো

হয়েছে, আর ‘কেতাব’ বলতে আল্ কুরআনকে.....মহানবী (দ:)-কে ’নূর’ (আলো) বলা হয়েছে, কারণ বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে আল্লাহ পাক তাঁর ঐশী ক্ষমতার আলো দ্বারা প্রথম যা সৃষ্টি করেন, তা হলো হুযূর পূর নূর (দ:)-এর নূর (জ্যোতি), যেমনিভাবে মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান: ‘আল্লাহতা’লা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেন’।” এই বর্ণনা নিচে দেয়া আছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য হলো, মু’তাযেলা সম্প্রদায়-ই (সর্বপ্রথম) দাবি করেছিল যে আলোচ্য আয়াতের (৫:১৫) মধ্যে ‘নূর’ শব্দটি কেবল কুরআনকেই বুঝিয়েছে এবং তা মহানবী (দ:)-কে উদ্দেশ্য করে নি। আলুসী ওপরে উদ্ধৃত তাঁর বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় আরও বলেন, “আবু আলী জুব্বায়ী বলেছিল যে ‘নূর’ বলতে কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা আল্ কুরআন হেদায়াতের ও নিশ্চয়তার পথের দিশা দিয়েছে। যামাখশারী নিজ ‘তাফসীরে কাশশাফ’ (১:৬০১) পুস্তকে এই ব্যাখ্যার সাথে একমত হয়েছেন। এ দুটো উৎস সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে আবদুল আযীয মুলতানীর ’আল নাবরাস’ কেতাবে (পৃষ্ঠা ২৮-২৯), যা’তে তিনি লিখেন: “তাফসীরে কাশশাফ নিজেকে মু’তাযেলা সম্প্রদায়ের বাবা হিসেবে ঘোষণা করে.....বসরা (ইরাক)-এর মু’তাযেলা সম্প্রদায়ের মুহাম্মদ ইবনে আবদিল ওয়াহহাব হলো আবু আলী জুব্বায়ী।” মু’তাযেলা এবং বর্তমানকালের ওহাবী ও ’সালাফী’-দের মধ্যকার সাযুজ্য তুলে ধরা হয়েছে ইমাম কাওসারীর ‘মাকালাত’ পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে মু’তাযেলীদের মতোই ওহাবীদের দ্বারা আউলিয়াবৃন্দ (রহ:)-এর (অনিন্দ্য) বৈশিষ্ট্যগুলোর অস্বীকারের অন্তরালে আম্বিয়া (আ:)-এর (নিখুঁত) বৈশিষ্ট্যগুলোর অস্বীকার লুক্কায়িত আছে।

আহলে সুন্নাহ (সুন্নী মুসলিম)-এর মাঝে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা আছে যা মহানবী (দ:)-কে আয়াতোক্ত ’নূর’ এবং ‘কেতাব’ উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে। মাহমুদ আলুসী নিজ ‘রূহুল মাআনী’ তাফসীর কেতাবে (৬:৯৭) বলেন, “আমি এটাকে সীমা অতিক্রম বলে মনে করি না যে ‘নূর’ (আলো) এবং ‘কেতাবুম্ মুবীন’ (প্রকাশ্য ঐশীগ্রন্থ) বলতে মহানবী (দ:)-কেই বোঝানো হয়েছে, সংযোজক অব্যয় পদ (ওয়া/এবং)-টি আল জুব্বায়ী যেভাবে ব্যবহার করেছে ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করে এটা করা যায় (অর্থাৎ, নূর এবং কেতাব বলতে সে যেভাবে বুঝে নিয়েছিল কুরআনকে)। এটা নিঃসন্দেহ যে মহানবী (দ:)-কে উদ্দেশ্য করেই সব বলা হয়েছে। হয়তো আপনারা ‘এবারা’ (অভিব্যক্তি)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হতে পারেন ; তাহলে ’ইশারা’ (সূক্ষ্ম ইঙ্গিত)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে তা গৃহীত হোক।”

আল কারী নিজ 'শরহে শিফা' (১:৫০৫, মক্কা সংস্করণ) গ্রন্থে বলেন, "এ কথাও বলা হয়েছে যে (আয়াতোক্ত) 'নূর' এবং 'কেতাবুম মুবীন' উভয়ই মহানবী (দ:)-এর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে; কেননা, তিনি যেমন মহৌজ্জ্বল জ্যোতি এবং সকল আলোর উৎসমূল, তেমনি তিনি হলেন মহান কেতাব যা সকল গোপন (রহস্য) জড়ো করে প্রকাশ করে থাকে।" গ্রন্থকার আরও বলেন (১:১১৪, মদীনা সংস্করণ): "দুটো বিশেষ্যকেই মহানবী (দ:)-এর বলে দৃঢ়োক্তি করার প্রতি কী আপত্তি থাকতে পারে, যেহেতু বাস্তবিকই তিনি হলেন সকল আলোর মাঝে তাঁর উৎকৃষ্ট উপস্থিতির কারণে মহৌজ্জ্বল আলো; আর প্রকাশ্য কেতাব তিনি-ই, যেহেতু তিনি সমস্ত ভেদের রহস্য একত্রিত করে সকল (ঐশী) আইন-কানুন, পরিস্থিতি ও বিকল্প (ব্যবস্থা) স্পষ্ট করেছেন।"

আল্লাহতা'লা এরশাদ ফরমান:

"তাঁর (আল্লাহর) আলোর (নূরের) উপমা হলো এমনই যেমন একটা দীপাধার যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ। ওই প্রদীপ একটা ফানুসের মধ্যে স্থাপিত। ওই ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মতো উজ্জ্বল হয় বরকতময় বৃক্ষ যায়তুন দ্বারা, যা না প্রাচ্যের, না প্রতীচ্যের; এর নিকটবর্তী যে, সেটার তেল প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠবে যদিও আগুন সেটাকে স্পর্শ না করে; আলোর (নূরের) ওপর আলো (নূর)।" (আল্ কুরআন, ২৪:৩৫)

ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) তাঁর 'আল রিয়াদ আল আনিকা' পুস্তকে বলেন, "হযরত ইবনে জুবায়র (রা:) ও হযরত কাআব আল আহবার (রা:) বলেছেন: '(আয়াতোক্ত) দ্বিতীয় 'নূর' দ্বারা মহানবী (দ:)-কে বোঝানো হয়েছে; কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে (আগত) যে জ্ঞানালোক ও সুস্পষ্ট (প্রমাণ), তিনি-ই তার সংবাদ দানকারী, প্রকাশক ও জ্ঞাপণকারী।' কাআব (রা:) বলেন, 'এর তেল প্রজ্জ্বলিত-প্রায় হবে, কারণ মহানবী (দ:) মানুষের কাছে পরিচিত-প্রায় হবেন, এমন কি যদি তিনি নবী হিসেবে নিজেকে দাবি না-ও করেন, ঠিক যেমনি ওই তেল আগুন ছাড়াই (প্রজ্জ্বলনের) আলো বিচ্ছুরণ করবে'।"

ইবনে কাসির তার 'তাফসীরে কাসির' কেতাবে ইবনে আতিয়্যা কর্তৃক বর্ণিত হযরত কাআব আল আহবার (রা:)-এর উপরোক্ত আয়াতের (ইয়াকাদু যাইতুহা ইউদিই-ইউ ওয়া লাও লাম

তামসাসহু নার) তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "হুযূর পাক (দ:)-এর নবুয়্যত মানুষের কাছে সুস্পষ্ট, এমন কি যদি তিনি তা ঘোষণা না-ও করেন।"

ইমাম কাজী আয়ায (রহ:) নিজ 'শেফা' গ্রন্থে (ইংরেজি সংস্করণ, ১৩৫ পৃষ্ঠা) বলেন, "নিফতাওয়াই আলোচ্য আয়াত (২৪:৩৫) সম্পর্কে বলেছেন: 'আল্লাহ তাঁর নবী (দ:)-এর বেলায় এই মিসাল (উপমা) দিয়েছেন। তিনি আয়াতে বুঝিয়েছেন যে মহানবী (দ:)-এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হবার আগেই তাঁর চেহারা মোবারকে নবুয়্যতের ছাপ ফুটে উঠেছিল, যেমনিভাবে হযরত ইবনে রাওয়াহা (রা:) ব্যক্ত করেছিলেন নিজ কবিতায় -
এমন কি আমাদের কাছে যদি (তাঁর নবুয়্যতের) সুস্পষ্ট চিহ্নও থাকতো,
তাঁর চেহারা মোবারক-ই আপনাদের সে খবর বলে দিতো।"

উপরোক্ত আয়াতে উদ্ধৃত 'মাসালু নূরিহী', অর্থাৎ, 'আল্লাহর নূর (জ্যোতি)-এর উপমা' বলতে মহানবী (দ:)-কে উদ্দেশ্য হয়েছে বলে যে সকল উলামা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ইবনে জারির তাবারী (তাফসীর ১৮:৯৫), ইমাম কাজী আয়ায (শেফা শরীফ), আল বাগাবী (মা'আলিমুত্ তানযিল ৫:৬৩), আল খাযিন-এর হাশিয়ায়, সাঈদ ইবনে হুবাইর ও আল দাহহাক হতে, আল খাযিন (তাফসীর ৫:৬৩) ইমাম সৈয়ুতী (দুররে মনসুর ৫:৪৯), যুরকানী (শরহে মাওয়াহিব ৩:১৭১), আল খাফাজী (নাসিম আল রিয়াদ ১:১১০, ২:৪৪৯) প্রমুখ।

আল নিশাপুরী নিজ 'গারাইব আল কুরআন' (১৮:৯৩) পুস্তকে বলেন, "মহানবী (দ:) নূর (আলো) এবং আলো বিচ্ছুরণকারী প্রদীপ।"

মোল্লা আলী কারী তাঁর 'শরহে শিফা' বইয়ে বলেন, "এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো, নূর বলতে মহানবী (দ:)-কে বুঝিয়েছে।"

আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান: **"হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (পরিজ্ঞাতা) (নবী-দ:)! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি 'উপস্থিত' 'পর্যবেক্ষণকারী' (হাযের-নাযের) করে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে; এবং আল্লাহর প্রতি তাঁরই নির্দেশে আহ্বানকারী ও আলোকোজ্জ্বলকারী প্রদীপ (ইমাম আহমদ রেযা খান কৃত তাফসীরে 'সূর্য' বলা হয়েছে)-স্বরূপ।"** (আল কুরআন

৩৩:৪৫-৬)

ইমাম কাজী বায়দাবী (রহ:) নিজ তাফসীরে লিখেন: "এটা সূর্য, কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'আমি সূর্যকে একটি প্রদীপ বানিয়েছি;' অথবা, এটা প্রদীপও হতে পারে।"

ইবনে কাসির তার তাফসীরে বলেন, "আল্লাহর বাণী: 'আলোকোজ্জ্বলকারী প্রদীপ', অর্থাৎ, (হে রাসূল) আপনি যে সত্য নিয়ে এসেছেন তাতেই আপনার সুউচ্চ মর্যাদা/মাহাত্ম্য প্রতিফলিত হয়েছে, যেমনিভাবে সূর্যের উদয় ও কিরণ দ্বারা বোঝা যায় (তার বৈশিষ্ট্য), যা কেউই অস্বীকার করেন না কেবল একগুঁয়েরা ছাড়া।"

রাগিব আল ইসফাহানী 'আল মুফরাদাত' (১:১৪৭) পুস্তকে বলেন, "সিরাজ (প্রদীপ) শব্দটি যা কিছু আলোক বিচ্ছুরণ করে তার সবগুলোকেই বোঝায়। "

'শরহে মাওয়াহিব' (৩:১৭১) গ্রন্থে ইমাম যুরকানী মালেকী (রহ:) বলেন, "মহানবী (দ:)-কে প্রদীপ বলা হয়েছে, কারণ এক প্রদীপ থেকে বহু প্রদীপে আলো জ্বালা হয়, তথাপিও ওই প্রদীপের আলোয় কোনো কমতি হয় না।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আনসারী (রহ:), যিনি আরবী কবি ইমরুল কায়েসের পৌত্র, তিনি মহানবী (দ:) সম্পর্কে নিজ কবিতায় বলেন:
'এমন কি আমাদের কাছে যদি (তাঁর নবুয়্যতের) সুস্পষ্ট চিহ্ন না-ও থাকতো
তাঁর চেহারা মোবারক-ই আপনাদের সে খবর বলে দিতো ।'

ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (রহ:) নিজ 'আল ইসাবা' পুস্তকে (২:২৯৯) এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন এবং বলেন, "মহানবী (দ:)-এর প্রশংসায় এটি সবচেয়ে সুন্দর পদ্য।"

হযরত ইবনে রাওয়াহা (রা:) সম্পর্কে ইবনে সাইয়্যেদ আল নাস নিজ 'মিনাহ আল মায' (পৃষ্ঠা ১৬৬) বইয়ে বলেন: ইবনে রাওয়াহা (রা:) মক্কা বিজয়ের আগে ৮ জুমাদা তারিখে 'মু'তা' দিবসে শাহাদাৎ বরণ করেন। ওই দিন তিনি অন্যান্য সেনাপতিদের সাথে সেনাপতিত্ব করছিলেন।

কবিদের একজন হিসেবে তিনি অনেক ভাল কাজ করেন এবং মহানবী (দ:)-এর প্রতি শত্রুদের অপবাদ খন্ডন করে যথোপযুক্ত জবাব দেন। তাঁর এবং তাঁর দুই বন্ধু হযরত হাসান বিন সাবেত (রা:) ও হযরত কাআব ইবনে যুহাইর (রা:) সম্পর্কেই নাযেল হয়েছিল কুরআনের আয়াত - 'শুধু যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তারা ব্যতিরেকে।' (কবিবৃন্দ ২৬:২২৭)

হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যিনি বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা:)-এর চেয়ে তৎপর আমি আর এমন কাউকে দেখিনি। একদিন রাসূলুল্লাহ (দ:)-কে তাঁর উদ্দেশ্যে বলতে শুনলাম, "বর্তমানের জন্যে যথাযথ কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও, যখন আমি তোমার দিকে তাকিয়ে আছি।" তৎক্ষণাৎ কবি উঠে দাঁড়ালেন এবং বল্লেন,

ইন্নী তাফাররাসতু ফীকাল খায়রা আঁরিফুহূ
ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু আন্না মা খানানী আল-বাসারু
আন্তা আল-নাবিই-ইয়্যু ওয়া মান ইউহরামু শাফা'আতাহু
ইয়াওমাল হিসাবি লাকাদ আযরা বিহিল কাদারু
ফা-সাব্বাত-আল্লাহু মা আতাকা মিন হাসানিন
তাসবিতা মূসা ওয়া নাসরান কাল্লাযী নুসিরু

অর্থ:
অন্তর্দৃষ্টিতে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার (চূড়ান্ত) ভালাই
এতে আমার নাই কোনো সন্দেহ-ই
আল্লাহ জানেন, এই অন্তর্দৃষ্টি আমার সাথে কভু বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই
নবী আপনি-ই
আর যে রয়েছে আপনার শাফায়াত বিনা-ই
রোজ কেয়ামতে তার ভাগ্য-ললাটে আঁকা হবে বে-ইজ্জতীর বিড়ম্বনা-ই
আল্লাহ সুদৃঢ় করুন সে সব ভালাই, তিনি আপনাকে দান করেছেন যা-ই
মূসা (আ:)-এর মতো দৃঢ়তা, আর বিজয় ওই একই ।।

এ কবিতা শুনে মহানবী (দ:) কবিকে বলেন, "আল্লাহ তোমাকেও দৃঢ় (অটল,অবিচল) করুন,

ওহে ইবনে রাওয়াহা!" হিশাম ইবনে উরওয়া আরও বলেন, বাস্তবিকই আল্লাহ তাঁকে সবচেয়ে সুদৃঢ় করেছিলেন (ঈমানী চেতনায়)। তিনি শহীদ হন; তাঁর জন্যে বেহেশ্তের দরজা খুলে দেয়া হয়, আর তিনি তাতে প্রবেশ করেন।

আল্লাহর একটি সিফাত (গুণ) হলো 'যুন্ নূর', যার অর্থ তিনি নূর (আলো)-এর স্রষ্টা এবং ওই নূর দ্বারা আসমান ও জমিন, আর সেই সাথে ঈমানদারদের অন্তরও হেদায়াতের আলো দ্বারা আলোকোজ্জ্বলকারী। ইমাম নববী (রহ:) নিজ 'শরহে সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে হুযূর পূর নূর (দ:)-এর দোয়া উদ্ধৃত করেন: "এয়া আল্লাহ, আপনি হলেন আসমান ও জমিনে নূর এবং সমস্ত প্রশংসা-ই আপনার....." (মুসাফিরদের নামায-বিষয়ক বই #১৯৯)

উপরোক্ত 'আপনি হলেন আসমান ও জমিনে নূর' - এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম বলেন: "আপনি-ই তাদেরকে (আপনার নূর দ্বারা) আলোকিত করেন এবং আপনি-ই তাদের নূর তথা আলোর স্রষ্টা।" হযরত আবু উবায়দা (রা:) বলেন, "এর অর্থ - আপনার নূর দ্বারাই আসমান ও জমিনে অবস্থানকারী সবাই হেদায়াত লাভ করেন।" আল্লাহর নাম 'নূর' সম্পর্কে আল্ খাত্তাবী তাঁর তাফসীরে লিখেন, "তিনি (আল্লাহ) এমন এক সত্তা যাঁর নূর দ্বারা অন্ধ দেখতে পায় এবং পথহারা পথের দিশা পায়, যেহেতু তিনি আসমান ও জমিনে নূর (আলো); আর এটাও সম্ভব যে 'নূর' বলতে 'যুন্ নূর'-কে বোঝানো হয়েছে। উপরন্তু, এটা সঠিক নয় যে 'নূর' আল্লাহতা'লার যাত মোবারকের গুণ (যাতী সিফাত/সত্তাগত গুণ), কেননা এটা 'সিফাতু ফে'লী' (গুণবাচক ক্রিয়া); অর্থাৎ, তিনি নূরের স্রষ্টা।" অন্যান্য উলামা বলেন, "আল্লাহ আসমান ও জমিনে নূর - এ বাক্যটির অর্থ হলো, তিনি ওগুলোর সূর্য ও চাঁদ ও তারাসমূহের কর্তা।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বর্ণনা করেন যে মহানবী (দ:) এরশাদ করেছেন: "মহান আল্লাহ সৃষ্টি জগত (মাখলুকাত)-কে অন্ধকারে (ফী যুলমাতিন) সৃজন করেন; অতঃপর তাদের প্রতি নিজ নূর মোবারক বিচ্ছুরণ করেন। যিনি-ই এই ঐশী আলোর স্পর্শে এসেছেন, তিনি-ই হেদায়াত পেয়েছেন; আর যে সত্তা এর স্পর্শ পায় নি, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাই আমি বলি, (ঐশী) কলম শুকনো এবং (সব কিছুই) আল্লাহর (ঐশী) ভবিষ্যৎ জ্ঞানের আওতাধীন।" (আল হাদীস)

ওপরের এই হাদীস ইমাম তিরমিযী (রহ:) সহীহ সনদে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

('হাসান' হিসেবে)। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) নিজ 'মুসনাদ' কেতাবের ২টি স্থানে, ইমাম তাবারানী (রহ:) তাঁর হাদীস সংকলনে, হাকিম (রহ:) নিজ 'মুসতাদরাক' পুস্তকে এবং ইমাম বায়হাকী (রহ:) তাঁর 'সুনান আল কুবরা' কেতাবে এটি বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনুল আরবী (রহ:) তিরমিযী শরীফের ওপর তাঁর ব্যাখ্যামূলক 'আরিদাত আল আহওয়াযী' গ্রন্থে (১০:১০৮) ইমাম তিরমিযী (রহ:)-এর বর্ণনার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে বলেন, "এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেকে ওই নূর থেকে ততোটুকুই পান যা আম (সাধারণ) ও খাস্ (সুনির্দিষ্ট)-ভাবে তাঁর জন্যে মঞ্জুর করা হয়েছে...তাঁর অন্তরে এবং শরীরে।"

উপরোল্লিখিত হাদীস ও হযরত কাজী ইবনে আরবী (রহ:)-এর ব্যাখ্যা পরিস্ফুট করে যে ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নূর (জ্যোতি), আর মহানবী (দ:) হলেন ইমানদারদের মধ্যে প্রথম এবং নূরের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হবার বেলায় সর্বাগ্রে, এমন কি ফেরেশতাবৃন্দ যারা নূরের সৃষ্টি, তাঁদেরও অগ্রে। ঈমানী ঘাটতি যাদের, শুধু তারাই এ সত্যটি অস্বীকার করতে পারে যে আল্লাহ যখন তাঁর নূর সৃষ্টিকুলের প্রতি বিচ্ছুরণ করেছিলেন , তখন মহানবী (দ:)-ই নিশ্চিতভাবে সর্বপ্রথমে ও সর্বাগ্রে ওই ঐশী জ্যোতির পরশ পেয়েছিলেন, এমন মাত্রায় তা পেয়েছিলেন যা কোনো ফেরেশতা, কোনো নবী (আ:) কিংবা কোনো জ্বিন-ই পান নি।

ওপরের আলোচনা এক্ষণে আলোতে নিয়ে এসেছে ইবনে তাইমিয়ার আক্ষরিকতার চোরা-গর্তকে, যখন সে তার 'মজমুয়াত আল ফাতাওয়া' নামের তাসাউফ-বিষয়ক প্রবন্ধে (১১:৯৪, ১৮:৩৬৬) দাবি করে যে মহানবী (দ:) কোনোক্রমেই নূরের পয়দা হতে পারেন না; কেননা, মানুষ মাটির সৃষ্টি যার মধ্যে রূহ ফোঁকা হয়েছে; পক্ষান্তরে, ফেরেশতাকুল নূরের সৃষ্টি। এই মতের সমর্থনে ইবনে তাইমিয়া মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ ও হযরত আয়েশা (রা:)-এর বর্ণিত হাদীসটি উদ্ধৃত করে, যা'তে হুযূর পূর নূর (দ:) এরশাদ ফরমান:

"ফেরেশতাকুলকে নূর (আলো) থেকে সৃষ্টি করা হয়, জ্বিন জাতিকে ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে, আর আদম (আ:)-কে তা থেকে যা তোমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে (আল কুরআনে)।"

কিন্তু মানবকে কখনো-ই নূরের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বলে বিবেচনা করা যাবে না , ওপরের হাদীস থেকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মানে হলো হুবহু ইবলিস (শয়তান)-এর সেই ভ্রান্ত ধারণারই

লালন, যখন সে মাটির চেয়ে ধোঁয়াবিহীন আগুনের শ্রেষ্ঠত্বের অজুহাতে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল। অধিকন্তু, এই বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত তিরমিযী শরীফে লিপিবদ্ধ ও হযরত ইবনে উমর (রা:) বর্ণিত (উপরোক্ত) সহীহ হাদীসের সাথে একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ, আর এই বিষয়টির একটি সঠিক ও সামগ্রিক উপলব্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় স্পষ্ট ব্যাখ্যারও পরিপন্থী।

এ বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আম্বিয়া (আ:)-বৃন্দ আল্লাহর দানকৃত নূর ও অন্যান্য নেয়ামতের প্রশ্নে ফেরেশ্তাদের চেয়েও উন্নত আল্লাহর এক সৃষ্টি, যে খোদায়ী দান ও নেয়ামত হযরত ইবনুল আরবী আল মালেকী (রহ:)-এর ভাষায় হতে পারে আম (সার্বিক) বা খাস (বিশেষ), তাঁদের কলব্ (অন্তর) বা জিসম (দেহ) মোবারকে সন্নিবেশিত। আম্বিয়া (আ:)-এর ফেরেশ্তাপ্রতিম অভ্যন্তরীন সিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে ইমাম কাজী আয়ায (রহ:) নিজ 'শেফা' পুস্তকে (ইংরেজি সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৭৭-৮) খোলাসা বর্ণনা দেন নিম্নে:

"নবী-রাসূলবৃন্দ আল্লাহতা'লা ও তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে মধ্যস্থতাকারীস্বরূপ। তাঁরা মহান প্রভুর আদেশ-নিষেধ, সতর্কবাণী ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সৃষ্টিকুলকে জানান এবং তাঁর আজ্ঞা, সৃষ্টি, পরাক্রম, ঐশী ক্ষমতা এবং মালাকুত সম্পর্কে তারা যা জানতো না, তাও তাদের জানিয়ে থাকেন। তাঁদের বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও শারীরিক গঠন অসুখ-বিসুখ, পরলোক গমন ইত্যাদি অনাবশ্যক বিষয়ে মানুষের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বলেই দৃশ্যমান।

"কিন্তু তাঁদের রূহ মোবারক ও অভ্যন্তরীন (অদৃশ্য) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানবিক গুণাবলীর অধিকারী, যা মহান প্রভুর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যা ফেরেশ্তাপ্রতিম গুণাবলীর অনুরূপ; আর কোনো পরিবর্তন (অধঃপতন) কিংবা খারাবির সম্ভাবনা থেকে যা মুক্ত। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত অক্ষমতা ও (মানবীয়) দুর্বলতা তাঁদের মধ্যে নেই। তাঁদের অভ্যন্তরীন গুণাবলী যদি তাঁদের বাহ্যিক মানবীয় আবরণের মতো হতো, তাহলে তাঁরা ফেরেশ্তার কাছ থেকে ওহী/ঐশী বাণী গ্রহণ করতে পারতেন না, ফেরেশ্তাদের দেখতেও পেতেন না, তাঁদের সাথে মেশতে ও সঙ্গে বসতেও পারতেন না, যেমনিভাবে আমরা সাধারণ মানুষেরা তা করতে পারি না।

"যদি আম্বিয়া (আ:)-এর বাহ্যিক কায়া মানবের মতো না হয়ে ফেরেশতাদের মতো গুণাবলীসম্পন্ন

হতো, তাহলে তাঁদেরকে যে মর্তের মানুষের মাঝে পাঠানো হয়েছিল তাদের সাথে তাঁরা কথা বলতে পারতেন না, যা আল্লাহ ইতোমধ্যে বলেছেন। অতএব, তাঁদের 'জিসমানিয়্যাত' তথা শারীরিক গঠনে তাঁরা মানবের সুরতে দৃশ্যমান , আর রূহ (আত্মাগত) এবং অভ্যন্তরীন গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁরা ফেরেশতাসদৃশ।"

ইমাম কাজী আয়ায (রহ:)-এর (ওপরে উদ্ধৃত) বিশদ ব্যাখ্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া বুঝতে পারে নি, এ ব্যাপারটি নিয়ে সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ আম্বিয়া (আ:) ফেরেশতাদের মতো নূরের পয়দা, এ বিষয়টি অস্বীকার করার পর আম্বিয়া (আ:), বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাতামুল আম্বিয়া (দ:) সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া আহলে সুন্নাতের সর্বজনজ্ঞাত আকিদা-বিশ্বাসটি-ই ব্যক্ত করে যে তাঁরা ফেরেশতাকুলের চেয়েও উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন; সে বলে:

"আল্লাহতা'লা তাঁর কিছু ক্ষমতা ও ঐশী জ্ঞান-প্রজ্ঞা সৎকর্মশীল নেক বান্দা আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেন, যা তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমে করেন না; কেননা তিনি প্রথমোক্ত দলটিতে সে সব গুণের সম্মিলন ঘটান যেগুলো তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো আছে। ফলে তিনি মানুষের কায়া মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং রূহ ফোঁকেন তাঁর নিজের থেকে; আর এই কারণেই এটা বলা হয়, 'মানুষ সৃষ্টিকুলের প্রতিনিধি এবং সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিকৃতি।'

"আল্লাহর দৃষ্টিতে মহানবী (দ:) হলেন আদম-সন্তানদের মধ্যে সরদার, সেরা সৃষ্টি, এবং সৃষ্টিকুলের মাঝে মহানতম। এ কারণেই কেউ কেউ বলেছেন , 'বিশ্বনবী (দ:)-এর খাতিরেই আল্লাহ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেন'; অথবা 'মহানবী (দ:) না হলে আল্লাহ আরশ-কুরসী, লওহ-কলম, আসমান-জমিন, চাঁদ-সূর্য কিছুই সৃষ্টি করতেন না।' তবে এটি হুযূর (দ:)-এর হাদীস নয়.....কিন্তু এটিকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।" (ইবনে তাইমিয়া)

ইবনে তাইমিয়া এরপর মহানবী (দ:)-এর কারণে আল্লাহ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন মর্মে বর্ণনার সপক্ষে তার দালিলিক প্রমাণ পেশ করে, যা আমরা আমাদের (মূল) বইয়ের (The 555 beautiful names of the Prophet) 'মোহাম্মদ' ও 'আহমদ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি (#১-২)।

সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা:) নিচের কবিতা নবী করীম (দ:)-এর শানে আবৃত্তি করেন:

আলা আন্না খায়রা আল-নাসি ফী আল-আরদি কুল্লিহীমি
নাবিই-ইউন জালা 'আন্না শুকুকা আল-তারাজ্জুমী
নাবিই-ইউন আতা ওয়া আল-নাসু ফী'উনজুহিয়্যাতিন
ওয়া ফী সাদাফিন ফী যুলমাতি আল-কুফরি মুতিমি
ফা আকশা'য়া বি আল-নূরি আল-মুদি'য়ী যালামাহু
ওয়া সা'য়াদাহু ফী আমরিহী কুল্লু মুসলিমি

"মহানবী (দ:) ধরণীর বুকে মানবকুল-শ্রেষ্ঠ এ কথা সত্য
যিনি আমাদের থেকে সন্দেহ-শংকা করেছেন বিদূরিত
তাঁর আবির্ভাব এমনই সময় যখন মানুষ দম্ভের সাগরে ছিল নিমজ্জিত
আর ছিল অবিশ্বাসের ঘন-কালো রাত্রির অন্ধকারে বিভ্রান্ত
অতঃপর তিনি (তাঁর) উজ্জ্বল আলো দ্বারা অন্ধকার করেন বিতাড়িত
আর এতে তাঁকে সাহায্য করেন যাঁরা ছিলেন খোদার প্রতি সমর্পিত "
(ভাব অনুবাদ)

ইবনে সাইয়্যেদ আল-নাস এটি বর্ণনা করেন 'মিনাহ আল-মায' পুস্তকে (পৃষ্ঠা ১৭৬)।

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দিল মুত্তালিব (রা:) মহানবী (দ:)-কে বলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)! আমি আপনার প্রশংসা করার ইচ্ছা পোষণ করি।" হুযূর পাক (দ:) উত্তর দেন, "অগ্রসর হোন -- আল্লাহ আপনার মুখকে রৌপ্যশোভিত করুন!" অতঃপর হযরত আব্বাস (রা:) বলেন:

"ধরাধামে শুভাগমনের আগে আপনি ছিলেন আশীর্বাদধন্য (পবিত্র) ছায়া ও ঔরসে - তা এমনই এক সময়ে যখন আদম (আ:) ও হাওয়া গাছের পাতা দিয়ে আব্রু সম্বরণ করতেন। অতঃপর আপনি এই বসুন্ধরায় নেমে এলেন মানুষ হিসেবে নয়; এক টুরো মাংস হিসেবেও নয়; কোনো জমাটবদ্ধ/ঘনীভূত পিন্ড হিসেবেও নয়; বরং এক ফোঁটার মতো (আকৃতিতে) যা (নূহ আলাইহিস

সালামের) কিস্তিতে আরোহণ করেন যখন মহাপ্লাবন ঈগল পাখি এবং অন্যান্য মূর্তিকে ধ্বংস করেছিল: যে ফোঁটা সময়ের পরিক্রমণে পবিত্র ঔরস থেকে পবিত্র গর্ভে ছিলেন অগ্রসরমান -- যতোক্ষণ না সমস্ত সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী মহাপ্রভু আপনার সুউচ্চ মর্যাদাকে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত খিনদিফ সমান পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে। আর তখনি, যখন আপনি এ ধরায় আবির্ভূত হন, একটি আলো পৃথিবীর ওপরে নিজ রশ্মি বিচ্ছুরণ করে, যা সারা পৃথিবীর আকাশ আলোকিত করে। আমরা সেই আলো দ্বারা আলোকিত, আর সেই আলোর উৎসমূল এবং সেই হেদায়াতের পথসমূহ দ্বারাও (যার জন্যে আমরা) কৃতজ্ঞ।"

ইবনে সাইয়্যেদ আল-নাস নিজ 'মিনাহ আল-মায' (পৃষ্ঠা ১৯২-৩) পুস্তকে এই বর্ণনা ইমাম তাবারানী (রহ:) ও আল-বাযযার-এর এসনাদে লিপিবদ্ধ করেন। এ ছাড়া ইবনে কাসির তার 'সীরাতে নববীয়্যা' (মোস্তফা আবদ্ আল-ওয়াহিদ সংস্করণ ৪:৫১) গ্রন্থে এবং মোল্লা আলী কারী নিজ 'শরহে শিফা' (১:৩৬৪) কেতাবে বলেন যে এটি আবু বকর শাফেয়ী ও ইমাম তাবারানী (রহ:) বর্ণিত এবং ইবনে আব্দিল বার কৃত 'আল-ইস্তিয়াব' ও ইবনে কাইয়েম আল্ জওযিয়া প্রণীত 'যাদ আল্ মা'আদ' বইগুলোতে উদ্ধৃত হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম বহুবার মহানবী (দ:)-কে নূর (জ্যোতি) বা আলোর উৎস, বিশেষ করে চাঁদ ও সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন তাঁর কবি হযরত হাসসান বিন সাবিত আনসারী (রহ:); তিনি লিখেন:
"তারাহহালা 'আন কওমিন ফাদ্দালাত 'উকুলাহুম
ওয়া হাল্লা 'আলা কওমিন বি নূরিন মুজাদ্দাদি।"

"তিনি এমন এক জাতিকে ত্যাগ করেন যারা নিজেদের খামখেয়ালিপূর্ণ মস্তিষ্ককে দিয়েছিল তাঁর চেয়ে বেশি গুরুত্ব
অতঃপর তিনি অপর এক জাতির ভাগ্যাকাশে উদিত হন নিয়ে নতুন আলোর দিগন্ত।"

(ভাব অনুবাদ)

"*মাতা ইয়াবদু ফী আল-দাজী আল-বাহিমি জাবিনুহু*

ইয়ালুহু মিসলা মিসবাহি আল-দুজা আল-মুতাওয়াক্কিদি ।”

অর্থ:

মহানবী (দ:)-এর পবিত্র ললাট যখনই আবির্ভূত হয়েছে ঘন কালো অন্ধকারে
তা অন্ধকার রাতে উজ্জ্বল তারকার মতোই দ্যুতি ছড়িয়েছে ।

ইমাম বায়হাকী (রহ:) তাঁর প্রণীত ‘দালাইল আন্ নবুয়্যত’ (১:২৮০, ৩০২) গ্রন্থে এই দুটো পংক্তি বর্ণনা করেন। পরবর্তী পংক্তিটি ইবনে আবদিল বারর নিজ ‘আল ইস্তিয়া’ব’ (১:৩৪১) বইয়ে এবং আল যুরকানী মালেকী তাঁর ‘শরহে মাওয়াহিব আল্ লাদুন্নিয়া পুস্তকেও বর্ণনা করেন।

হযরত আবু উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা:) বর্ণনা করেন: আমি হযরত রুবাইয়ী বিনতে মু’আওয়ায (রা:)-কে জিজ্ঞেস করি, “মহানবী (দ:) সম্পর্কে বর্ণনা করুন।” তিনি উত্তর দেন, “তুমি তাঁকে দেখলে বলতে: সূর্যোদয় হচ্ছে।”

এই বর্ণনা ইমাম বায়হাকী (রহ:) উদ্ধৃত করেছেন তাঁর ‘দালাইল আন্ নবুয়্যত’ (১:২০০) কেতাবে; আর ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (রহ:) নিজ ‘মজমাউল যাওয়াইদ’ (৮:২৮০) গ্রন্থে; তাতে তিনি বলেন যে ইমাম তাবারানী (রহ:)-ও স্বরচিত ‘মু’জাম আল কবীর’ ও ‘আল আওসাত’ পুস্তক দুটোতে এটা রওয়ায়াত করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত কাআব ইবনে মালেক (রা:) বলেন, ”আমি হুযূর পূর নূর (দ:)-কে সালাম দেই, আর তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি যখনই খুশি হতেন , তাঁর চেহারা মোবারক এমন উজ্জ্বল হতো যেন চাঁদের টুকরো।”

আল বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে; ইমাম আহমদ (রহ:)-ও এটা বর্ণনা করেছেন নিজ ‘মুসনাদ’ কেতাবে। ইমাম বায়হাকী (রহ:) তাঁর কৃত ‘দালাইল আন্ নবুয়্যত’ (১:৩০১) কেতাবে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্যদের বাণী বিধৃত করেন যা নিচে দেয়া হলো:

রাসূলুল্লাহ (দ:) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলে তাঁর ফুপু হযরত 'আতিকা বিনতে আবদিল মুত্তালিব, যদিও ইমাম বায়হাকী (রহ:) বলেন যে তিনি কুরাইশের ধর্ম তখনো অনুসরণ করছিলেন, তিনি নিচের চরণটি আবৃত্তি করেন -

'আয়নাইয়া জুদা বি আল-দুমুঈ আল-সাওয়াজিমি
'আলা আল-মুরতাদা কাল-বাদরি মিন আলে হাশেমী

অর্থ:

আমার নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত অনন্যতায় মনোনীত জনের শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ
যিনি হাশেমী পরিবারের পূর্ণ চন্দ্ররূপ ।।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) মহানবী (দ:) সম্পর্কে বলেন:

আমিনুন মোস্তফা (দ:) লি আল-খায়রি ইয়াদ্দউ
কা দাও'উই আল-বাদরি যাএয়ালাহু আল-যালামু

অর্থ:

এক বিশ্বাসভাজন, মনোনীত জন, যিনি কল্যাণের পথে করেন আহ্বান
যেন অন্ধকার রাতে পূর্ণ চন্দ্রের কিরণ ।।

হযরত উমর (রা:) আবৃত্তি করতেন নিম্নের পংক্তি:

লাও কুনতা মিন শাইয়্যিন সিওয়া বাশারিন
কুনতা আল-মুদিআ' লি লায়লাত আল-বাদরি

অর্থ:

“যদি আপনি হতেন মানবের সুরত-বহির্ভূত কোনো কিছু ভিন্ন
তবে তা হতো সেই রাতের আলো যাতে চাঁদ হয় পূর্ণ।।”

ইমাম বায়হাকী (রহ:) এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেন নিজ ‘দালাইল আন্ নবুওয়া’ (১:৩০১-৩০২) গ্রন্থে এবং বলেন যে হযরত উমর (রা:) উক্ত পংক্তির সাথে আরও যোগ করেছিলেন, “মহানবী (দ:) এ রকম ছিলেন; তিনি ছাড়া আর কেউই এ রকম নয়।”

জামি’ ইবনে শাদ্দাদ বলেন: আমাদের গোত্রভুক্ত এক ব্যক্তিকে তারেক নামে ডাকা হতো [মোল্লা আলী কারী বলেন, ’ইনি সাহাবী হযরত শিহাব আবু ‘আবদ-আল্লাহ আর-মুহারিবী (রহ:), যিনি হাদীস বর্ণনা করেন’]। তিনি বর্ণনা করেন যে মহানবী (দ:)-এর সাথে মদীনায় তাঁর সাক্ষাৎ হয়; হুজূর পাক (দ:) জিজ্ঞেস করেন, “তোমাদের সাথে এমন কিছু আছে যা তোমরা বিক্রি করবে?” আমরা জবাবে বলি, এই উট বিক্রি করবো। রাসূলুল্লাহ (দ:) জিজ্ঞেস করেন, “কতো?” আমরা বলি, ‘এতো ওয়াসক্ (প্রতি এককে প্রায় ২৪০ দু’ অঞ্জলি-ভর্তি) খেজুর।’ মহানবী (দ:) উটের লাগাম নিজ হাত মোবারকে নিয়ে মদীনা চলে গেলেন। তারেক ও তাঁর সাথী বল্লেন, “আমরা এমন একজনের কাছে (উট) বিক্রি করলাম যাঁকে আমরা চেনি-ও না।” আমাদের গোত্রের এক মহিলা বল্লেন, “আমি তোমাদেরকে এই উটের দাম পাবার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। তাঁর চেহারা মোবারককে পূর্ণচন্দ্রের মতো দেখেছি। তিনি ঠকাবেন না।” পরের দিন সকালে এক ব্যক্তি ওই খেজুর নিয়ে এলেন এবং বল্লেন, “আমি আল্লাহর রাসূল (দ:)-এর প্রতিনিধি। তিনি আপনাদের এই খেজুর খেয়ে সুস্বাস্থ্য লাভ করতে বলেছেন।” অতঃপর আমরা তাই করি।

ইমাম কাজী আয়ায (রহ:) এই ঘটনা তাঁর ‘শেফা শরীফ’ গ্রন্থে (ইংরেজি, পৃষ্ঠা ১৩৫), ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) নিজ ‘মানাহিল আল-সাফা’ (পৃষ্ঠা ১১৪#৫১৫) কেতাবে এবং মোল্লা আলী কারী তাঁর ‘শরহে শেফা’ পুস্তকে (১:৫২৫) এটা রওয়ায়াত করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেন যে রাসূলে খোদা (দ:) সেজদারত অবস্থায় আরয করেন: ”এয়া আল্লাহ! আপনি আমার কলবে (অন্তরে) নূর (আলো/জ্যোতি) স্থাপন করুন; আরও স্থাপন করুন আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিতে, আমার ডানে ও বামে, আমার সামনে ও পেছনে, ওপরে ও নিচে; আমার জন্যে নূর সৃষ্টি করুন।” অথবা তিনি বলেন, “আমাকে নূর (আলো)

করুন।” হযরত সালামা (রা:) বলেন, “আমি কুরাইব (রা:)-এর দেখা পাই এবং তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:)-কে উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: “আমি আমার খালা মায়মুনা (রা:)-এর সাথে ছিলাম; এমন সময় রাসূলুল্লাহ (দ:) সেখানে আসেন এবং ওই হাদীসের বাকি অংশ ব্যক্ত করেন, যা গুনদার বর্ণনা করেছিলেন, আর নিঃসন্দেহে এই কথাও যোগ করেন, “আমাকে নূর (আলো) করুন।”

ইমাম মুসলিম (রহ:) এটি তাঁর সহীহ গ্রন্থের ‘সালাত আল-মুসাফিরীন’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (রহ:)-ও নিজ ’মুসনাদ’ কেতাবে শক্তিশালী সনদে এটি বর্ণনা করেন, তবে ওপরে উদ্ধৃত প্রথম রওয়ায়াতের বিপরীত দিক হতে; যার ফলে হুজূর (দ:)-এর ভাষ্য এ রকম হয়: “আর আমাকে নূর (আলো) করুন”, অথবা তিনি বলেছিলেন, “আমার জন্যে নূর সৃষ্টি করুন।” ইমাম ইবনে হাজর (রহ:) তাঁর ‘ফাতহুল বারী’ (১৯৮৯ ইং সংস্করণ, ১১:১৪২) কেতাবে ইবনে আবি আসিমের রচিত ‘কেতাব আল-দু’আ’-এর উদ্ধৃতি দেন যা’তে বিবৃত হয়েছে: “আর আমাকে মঞ্জুর করুন নূরের ওপর নূর” (ওয়া হাবলী নূরান ‘আলা নূর)। মহানবী (দ:)-এর শরীর মোবারকের অন্যান্য অংশের কথা উল্লেখকারী এই হাদীসের আরও বহু নির্ভরযোগ্য বর্ণনা রয়েছে। ইমাম ইবনে হাজর বলেন যে ইমাম আবু বকর ইবনে আরবী (রহ:)-এর হিসেবমতে সমস্ত বর্ণনায় হুজূর পূর নূর (দ:)-এর নিজের জন্যে প্রার্থিত নূরের সংখ্যা ২৫টি। এগুলো নিম্নরূপ:

মহানবী (দ:)-এর কলবে নূর
জিহ্বায় নূর
শ্রবণশক্তিতে নূর
দৃষ্টিতে নূর
ডানে, বামে, সামনে, পেছনে, ওপরে এবং নিচে নূর
আত্মাতে নূর
বক্ষে নূর
পেশীতে নূর
মাংসে নূর
রক্তে নূর
চুলে নূর

চামড়ায় নূর
হাড়ে নূর
রওযায় নূর
"আমার জন্যে আলো বৃদ্ধি করুন"
"আমায় অসীম আলো দিন"
"আমায় আলোর ওপর আলো দিন"
"আমায় আলো করুন"।

মহানবী (দ:) সর্বপ্রথম তাঁর মায়ের কাছে দেখা দেন নূর তথা উজ্জ্বল জ্যোতির আকৃতিতে যা তাঁর মায়ের সামনে দুনিয়াকে এমনই আলোকিত করে যে তিনি মক্কায় অবস্থান করে সিরিয়ার প্রাসাদগুলোও স্পষ্ট দেখতে পান:

'এরবাদ ইবনে সারিয়া (রা:) ও আবু এমামা (রা:) বলেন যে রাসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ করেন, "আমি হলাম আমার পিতা (পূর্বপুরুষ) ইবরাহীম (আ:)-এর দোয়া, এবং আমার ভাই ঈসা (আ:)-এর দেয়া শুভসংবাদ। যে রাতে ধরাধামে আমার শুভাগমন হয়, আমার মা এমনই এক নূর দেখতে পেয়েছিলেন যা দামেস্কের দূর্গগুলো আলোকিত করেছিল এবং আমার মা ওই আলোর রৌশনিতে সেগুলো দেখেছিলেন।"

ওপরের এই হাদীস বর্ণনা করেছেন আল্ হাকিম (রহ:) তাঁর 'মুস্তাদরাক' পুস্তকে (২:৬১৬-১৭), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) নিজ 'মুসনাদ' কেতাবে (৪:১৮৪), এবং ইমাম বায়হাকী (রহ:) স্বরচিত 'দালাইল আল-নবুওয়া' গ্রন্থে (১:১১০, ২:৮)। ইবনুল জওযী এটি উদ্ধৃত করেন 'আল ওয়াফা' কেতাবে (পৃষ্ঠা ৯১, বেদায়াত নাবিই-ইনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২১তম অধ্যায়) এবং ইবনে কাসির 'মাওলিদে রাসূলিল্লাহ' ও 'তাফসীরে কাসির' (৪:৩৬০) গ্রন্থগুলোতে। ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী শাফেয়ী (রহ:) এই বর্ণনা নিজ 'মজমা' আল-যাওয়াইদ (৮:২২১) কেতাবে উদ্ধৃত করে বলেন যে ইমাম তাবারানী (রহ:) এবং ইমাম আহমদ হাম্বল (রহ:)-ও এটি বর্ণনা করেছেন; আর ইমাম আহমদ (রহ:)-এর সনদ 'হাসান' (উত্তম)।

ইবনে ইসহাক তাঁর কৃত প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ইতিহাস পুস্তকে ইবনে হিশামের সার-

সংক্ষেপমূলক ‘সীরাতে রাসূল-আল্লাহ’ (দারুল উইফাক্ব সংস্করণ, ১/২:১৬৬) বইয়ের অনুরূপ কিন্তু দীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন; ইবনে ইসহাক বলেন:

সাওর ইবনে ইয়াযিদ আমার কাছে বর্ণনা করেন কোনো এক আলেমের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়ে, যিনি আমার মনে হয় খালেদ ইবনে মা’দান আল-কালা’ঈ হবেন; বর্ণনামতে একবার সাহাবীদের একটি ছোট দল হুজূর পূর নূর (দ:)-এর কাছে আরয করেন, ’এয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)! আমাদেরকে আপনার সম্পর্কে বলুন।’ তিনি উত্তর দেন, ”আমি হলাম আমার পিতা (পূর্বপুরুষ) ইবরাহীম (আ:)-এর দোয়া, এবং আমার ভাই ঈসা (আ:)-এর প্রদত্ত শুভসংবাদ; আর সেই নূর যা আমার মা আমার জন্মকালীন সময়ে দেখেছিলেন তাঁর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে সিরিয়ার দূর্গগুলোকে আলোকিত করেছিল। আমার (শৈশবকালীন) যত্ন নিয়েছিল বনু সা’য়াদ ইবনে বকর। আমি যখন আমার এক ভাইয়ের সাথে আমাদের ঘরের পাশে অবস্থান করছিলাম, তখন দু’জন ব্যক্তি (ফেরেশতা) ধবধবে সাদা পোষাকে আমার কাছে আসেন; তাঁদের হাতে ছিল বরফ (তুষার)-ভর্তি একটি পাত্র। তাঁরা আমার বক্ষ বিদীর্ণ করেন এবং হৃদযন্ত্র বের করে তা খোলেন, আর তা থেকে এটি কালো পিন্ড বের করে ফেলে দেন। অতঃপর তাঁরা আমার হৃদযন্ত্র ও বক্ষকে ওই বরফ দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করেন। এরপর তাঁদের একজন অপরজনকে বলেন, ‘এঁকে ওনার জাতির দশজনের সাথে (পাল্লায়) ওজন দাও।’ তা দেয়া হলে আমি ওই দশজনের চেয়ে ভারি হই। ওই দু’জনের প্রথম জন আবার বলেন, ‘তাঁর জাতির এক’শ জনের সাথে ওজন দাও।’ তা করা হলে আমি আবারও ভারি হই। এমতাবস্থায় প্রথম জন আবার বলেন, ‘এক হাজার জনের সাথে এবার ওজন দাও।’ তা করা হলে এবারও আমি ভারি হই। অতঃপর তিনি বলেন, ‘তাঁকে ছেড়ে দাও! কেননা, আল্লাহর শপথ, তুমি যদি তাঁকে তাঁর সমগ্র জাতির সাথে ওজন দিতে , তাও তিনি ওজনে ভারি হতেন।’ [ইবনে জারির তাবারীর বর্ণনায় আরও যুক্ত আছে: “তাঁরা এরপর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে দু’চোখের মাঝখানে চুম্বন করেন এবং বলেন, ‘এয়া হাবীব (দ:)! ভয় পাবেন না; নিশ্চয় আপনি যদি জানতেন সে ভালাই সম্পর্কে যা আপনার দ্বারা হতে যাচ্ছে, তাহলে আপনি খুশি (সন্তুষ্ট) হতেন’।”

এই বিবরণ তাবারীর ইতিহাসেও লিপিবদ্ধ আছে। সাওর ইবনে ইয়াযিদ এবং খালেদ ইবনে মা’দান দু’জনই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী যাঁদের কাছ থেকে ইমাম বুখারী (রহ:) ও অন্যান্য

হাদীসবেত্তা হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম কাজী আয়ায (রহ:) তাঁর প্রণীত 'শেফা শরীফ' গ্রন্থে মহানবী (দ:)-এর সুউচ্চ বংশ পরিচয় ও তার শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ক অধ্যায়ে বলেন:
"হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেন যে আল্লাহতা'লা হযরত আদম (আ:)-কে সৃষ্টি করারও ২০০০ বছর আগে মহানবী (দ:)-এর রূহ মোবারক মহান প্রভুর হুযূরে (উপস্থিতিতে) নূরের আকৃতিতে অস্তিত্বশীল ছিলেন। ওই নূর খোদাতা'লার প্রশংসা ও বন্দনা করতেন, আর ফেরেশতাকুল ওই নূরের প্রশংসা করতেন। আল্লাহতা'লা যখন হযরত আদম (আ:)-কে সৃষ্টি করেন, তখন তিনি ওই নূরকে আদম (আ:)-এর পবিত্র কোমরের পেছনের দিকে বিচ্ছুরণ করেন।"

ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) নিজ 'মানাহিল আল্ সাফা' (পৃষ্ঠা ৫৩ #১২৮) পুস্তকে বলেন: "(ওপরের বর্ণনাটি) ইবনে আবি উমর আল-'আদানী তাঁর 'মুসনাদ' কেতাবে উদ্ধৃত করেছেন।" 'তাখরিজ আহাদীস শরহ আল-মাওয়াকিফ' (পৃষ্ঠা ৩২ #১২) গ্রন্থে ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) এটি উদ্ধৃত করেন এভাবে: "আল্লাহতা'লার উপস্থিতিতে কুরাইশ ছিল একটি নূর।" ইবনে আল-কাততান তাঁর 'আহকাম' কেতাবে (১:১২) এই বর্ণনা ভিন্ন আকারে পেশ করেন, যদিও আবদুল্লাহ আল-গিমারী নিজ 'এরশাদ আত্ তালেব' পুস্তকে একে বানোয়াট বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন:

"আলী ইবনে হুসাইন (রহ:) তাঁর পিতা ইমাম হসাইন (রা:) হতে, তিনি তাঁর পিতা হযরত আলী (ক:) হতে বর্ণনা করেন যে হুযূর পাক (দ:) এরশাদ ফরমান, 'আল্লাহতা'লা হযরত আদম (আ:)-কে সৃষ্টি করার চৌদ্দ হাজার বছর আগে আমি ছিলাম মহান প্রভুর উপস্থিতিতে একটি নূর (আলো)'।"

অনুরূপ বর্ণনাসমূহ লিপিবদ্ধ আছে ইমাম আহমদ (রহ:)-এর 'ফযায়েলে সাহাবা' (২:৬৬৩ #১১৩০), ইমাম যাহাবী (রহ:)-এর 'মিযান আল-এ'তেদাল' (১:২৩৫), এবং ইবনে জারির তাবারীর 'আল-রিয়াদ আল-নাদিরা' (২:১৬৪, ৩:১৫৪) বইগুলোতে। ওপরের বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত হলো নিচের বর্ণনাগুলো:

হযরত ’আমর ইবনে ’আবাসা (রা:) রওয়ায়াত করেন যে মহানবী (দ:) এরশাদ করেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহতা’লা তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করার দু’হাজার বছর আগে তাদের রূহ ফুঁকেছিলেন। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা একে অপরকে চেনতে পেরেছিল, তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়; যারা চেনতে পারে নি, তারা দূরে সরে থাকে।”

ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) নিজ ‘তাখরিজ আহাদীস শরহ আল-মাওয়াকিফ’ (পৃষ্ঠা ৩১ #১০) গ্রন্থে বলেন যে এই বর্ণনা ইবনে মানদাহ উদ্ধৃত করেছিলেন, যদিও ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (রহ:) এটিকে ভীষণ দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেন।

“যিনি (আল্লাহ) দেখেন আপনাকে (রাসূল-দ:) যখন আপনি দন্ডায়মান হন (নামাযে, দোয়ায় কিংবা কোনো স্থানে); এবং নামাযীদের মধ্যে আপনার পরিদর্শনার্থে ভ্রমণকেও” (সূরা শুয়ারা, ২১৮-৯ আয়াত) - আল কুরআনের এই আয়াতের মধ্যে ‘তাক্কাল্লুবাক’ (আপনার পরিদর্শনার্থে ভ্রমণ) শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: “আপনার পূর্বপুরুষদের ঔরসে আপনার (পৃথিবীতে) শুভাগমন।” এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন আল-হাকিম নিজ ‘আল-মুস্তাদরাক’ (২:৩৩৮) কেতাবে এবং এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেছেন ইবনে মারদাওয়াঈ, আল-রাযী, ইমাম সৈয়ুতী ও অন্যান্য জ্ঞান বিশারদ।

আল-শেহরেস্তানী স্বরচিত ‘আল-মিলাল ওয়ান্ নিহাল’ কেতাবে (২:২৩৮) বলেন: “মহানবী (দ:)-এর নূর হযরত ইবরাহীম (আ:) থেকে হযরত ইসমাঈল (আ:) পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এরপর তাঁর আওলাদে পাকের মাধ্যমে আবদুল মুত্তালিবের কাছে আসে.....আর এই নূরের বরকতে (আশীর্বাদে) আল্লাহতা’লা বাদশাহ আবরাহার অনিষ্ট দূর করে দেন” (ওয়া বি-বারাকাতি যালিক আল-নূর দাফা’ আল্লাহু তা’লা শাররা আবরাহা)।

ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) তাঁর অনেক বইয়ে ওপরের এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন; উদাহরণস্বরূপ, ‘মাসালিক আল-হুনাফা’ (পৃষ্ঠা ৪০-১), ’আল-দুরূজ আল-মুনিফা’ (পৃষ্ঠা ১৬) এবং ‘আল-তা’যিম ওয়া আল-মিন্না’ (পৃষ্ঠা ৫৫)। মহানবী (দ:)-এর বাবা-মা যে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাবৃন্দ কর্তৃক বেহেশতী হিসেবে বিবেচিত, তার ভিত্তি প্রমাণ করতেই তিনি এ বইগুলো রচনা করেন।

আল-যুহরী বর্ণনা করেন: ‘আবদুল্লাহ ইবনে আবদিল মোত্তালিব ছিলেন কুরাইশ বংশীয় পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন। একদিন তিনি কোথাও বের হলে তাঁকে কুরাইশ বংশের এক দল রমনী দেখতে পান। তাদের একজন বলেন, “ওহে কুরাইশ নারীকুল! তোমাদের মধ্যে কে এই যুবককে বিয়ে করবে এবং ফলশ্রুতিতে তাঁর দু’চোখের মাঝখানে অবস্থিত নূর (জ্যোতি) লাভ করবে?” সত্যি তাঁর দু’চোখের মাঝখানে আলো প্রভা ছড়াচ্ছিল। অতঃপর আমেনা বিনতে ওয়াহব ইবনে আবদিল মানাফ ইবনে যুহরার সাথে তাঁর বিয়ে হয়; তাঁদের ঘরেই মহানবী (দ:)-এর আবির্ভাব হয়।

আল-বায়হাকী (রহ:) এটি বর্ণনা করেন তাঁর ‘দালাইল আন্ নবুওয়া’ পুস্তকে (১:৮৭); তাবারী নিজ ‘তারিখ’ (২:২৪৩) কেতাবে; ইবনুল জওযী স্বরচিত ‘’আল-ওয়াফা’ বইয়ে (পৃষ্ঠা ৮২-৩, আবওয়াবে বেদাএয়াতি নাবিই-ইনা ১৬ নং অধ্যায়)। ইবনে হিশামও অনুরূপ একটা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন, তবে ওর সনদ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে (গুইলওমে অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৬৮-৯ দেখুন)।

এ মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, বনূ আসাদ গোত্রের এক নারী, যিনি ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের বোন, তিনি আবদুল্লাহর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন; কিন্তু আবদুল্লাহ আমেনা বিনতে ওয়াহবকে বিয়ে করেন। অতঃপর তিনি আমেনার সঙ্গ ত্যাগ করে বিয়ের প্রস্তাবকারিনী ওই মহিলার কাছে যান এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন কেন তিনি একদিন আগে বিয়ের প্রস্তাব দেননি। এর প্রত্যুত্তরে ওই মহিলা তাঁকে বলেন, যে জ্যোতি তিনি আগের দিন দেখেছিলেন, তা আবদুল্লাহকে ত্যাগ করেছে; আর তাই তাঁকে ওই মহিলার এখন কোনো প্রয়োজন নেই। মহিলা তাঁকে বলেন, “তুমি যখন আমাকে অতিক্রম করছিলে, তখন তোমার দু’চোখের মাঝখানে একটি নূরের সাদা ঝলক ছিল। আমি তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আমেনাকে বিয়ে করলে; ওই নূর আমেনা নিয়ে গিয়েছে।”

বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবের ইবনে আব্দিল্লাহ (রা:) হুযূর পাক (দ:)-এর কাছে আরয করেন: “এয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)! আপনার জন্যে আমার পিতা-মাতা কুরবান হোন। আল্লাহ সবার আগে কী/কাকে সৃষ্টি করেছিলেন তা আমাদের বলুন।” মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান: ”ওহে জাবের! আল্লাহ সর্বপ্রথম তাঁর নূর হতে তোমাদের নবী (দ:)-এর নূর সৃষ্টি করেছিলেন, আর ওই নূর তাঁর

কুদরতের মাঝে অবস্থান করেন ততোক্ষণ, যতোক্ষণ মহান প্রভু ইচ্ছা করেন; ওই সময়ে অস্তিত্ব না ছিল লওহের, না ছিল কলমের, না বেহেশতের, না দোযখের, না জাহান্নামের, না ফেরেশতার, না আসমানের, না জমিনের। আর যখন আল্লাহতা'লা তামাম মাখলুকাত সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি ওই নূরকে চারভাগে বিভক্ত করলেন: প্রথমটি দ্বারা বানালেন কলম; দ্বিতীয়টি দ্বারা লওহ; তৃতীয়টি দ্বারা আরশ; এবং চতুর্থটি দ্বারা বাকি সব কিছু।"

উলামায়ে ইসলামের মাঝে এই বর্ণনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিভিন্ন রকমের। তাঁদের বক্তব্য নিম্নে দেয়া হলো:

ভারতীয় হাদীসবেত্তা আবদূল হক দেহেলভী (ইনতেকাল ১০৫২ হিজরী) এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন নিজ পারসিক 'মাদারিজুন্ নবুওয়াত' পুস্তকে (২:২, মাকতাবা আল-নূরিয়্যা সংস্করণ, সাখোর) এবং বলেন যে এটা সহীহ (বিশুদ্ধ)।

অপর ভারতীয় আলেম আবদুল হাই লৌক্ষ্মভী স্বরচিত 'আল-আসার আল-মারফু'আ ফী আল-আখবার আল-মওদু'আ' (পৃষ্ঠা ৩৩-৪, লাহোর সংস্করণ) গ্রন্থে এর উদ্ধৃতি দেন এবং বলেন, "নূরে মোহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আবদ আল-রাযযাক (রহ:)-এর বর্ণনায়, যা'তে এর পাশাপাশি রয়েছে সমগ্র সৃষ্টিকুলের ওপরে ওর সুস্পষ্ট অগ্রাধিকার।"

'আল মাওয়াহিব আল লাদুন্নিয়া' (১:৫৫) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ইমাম কসতলানী (রহ:)-এর ভাষ্যানুযায়ী হযরত আবদ্ আল-রাযযাক (বেসাল-২১১ হিজরী) তাঁর রচিত 'মুসান্নাফ' কেতাবে ওপরের ঘটনাটি বর্ণনা করেন; ইমাম যুরকানী মালেকীও এটি বর্ণনা করেন নিজ 'শরহে মাওয়াহিব' পুস্তকে (মাতবা'আ আল-'আমিরা, কায়রো সংস্করণের ১:৫৬)। হযরত 'আবদ্ আল-রাযযাক (রহ:)-এর রওয়ায়াতের বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-ই নেই। ইমাম বুখারী (রহ:) তাঁর কাছ থেকে ১২০টি এবং ইমাম মুসলিম (রহ:) ৪০০টি বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

আহমদ আবেদীন শামী (বেসাল-১৩২০ হিজরী), যিনি হানাফী আলেম ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ:)-এর ছেলে, তিনি ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (রহ:)-এর কৃত 'আন-নি'মাত আল-কুবরা 'আলাল 'আলম ফী মওলিদে সাইয়্যেদে ওয়ালাদে আদম' পুস্তকের ব্যাখ্যামূলক বইয়ে

এই হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করেন। ইমাম ইউসুফ নাবহানী (রহ:) তাঁর 'জওয়াহির আল-বিহার' কেতাবে (৩:৩৫৪) এর উদ্ধৃতি দেন।

ইমাম কসতলানী (রহ:)-এর 'মাওয়াহিব' থেকে পুরো হাদীসখানা উদ্ধৃত করেন ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ আজলুনী (ইন্তেকাল-১১৬২ হিজরী) নিজ 'কাশফ আল-খাফা' গ্রন্থে (মাকতাবাত আল-গাযযালী, বৈরুত সংস্করণের ১:২৬৫)।

সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী তাঁর কৃত 'তাফসীরে রুহুল মাআনী' (বৈরুত সংস্করণের ১৭:১০৫) কেতাবে বলেন, "সবার প্রতি বিশ্বনবী (দ:)-এর রহমত (খোদায়ী করুণা) হওয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ত রয়েছে এই বাস্তবতার সাথে যে, তিনি-ই সৃষ্টির প্রাক্ লগ্ন থেকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্যে ঐশী করুণাধারার মাধ্যম/মধ্যস্থতাকারী (ওয়াসিতাত্ আল-ফায়দ আল-এলাহী 'আলাল মুমকিনাত্ 'আলা হাসাব আল-কাওয়াবিল); আর এ কারণেই তাঁর নূর (জ্যোতি)-কে সর্বপ্রথমে সৃষ্টি করা হয়, যেমনিভাবে বর্ণিত হয়েছে হাদীসে, 'ওহে জাবের, আল্লাহ সর্বপ্রথম তোমাদের নবী (দ:)-এর নূরকে সৃষ্টি করেন'; আরও এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ দাতা, আমি বন্টনকারী' (আল-কাসেম #২৬১ দেখুন)। সূফীবৃন্দ, আল্লাহ তাঁদের ভেদের রহস্যের পবিত্রতা দিন, এই অধ্যায় সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন।" আলুসী 'রুহুল মাআনী' (৮:৭১) পুস্তকের অন্য আরেকটি এবারতে হযরত জাবের (রা:)-এর হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করেন।

সাইয়েদ আবুল হাসান আহমদ ইবনে আবদিল্লাহ (বেসাল-৩য় হিজরী শতক) নিজ 'আল-আনওয়ার ফী মওলিদ আন্ নবী মোহাম্মদ 'আলাইহে আল-সালাত আল-সালাম' কেতাবে (নাজাফ সংস্করণের ৫ পৃষ্ঠায়) হযরত আলী (ক:) থেকে নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেন; নবী পাক (দ:) এরশাদ ফরমান: "আল্লাহ (অনন্তকালে) ছিলেন এবং তাঁর সাথে কেউ ছিল না; তিনি সর্বপ্রথম তাঁর মাহবুবের নূর সৃষ্টি করেন; এর ৪০০০ বছরের মধ্যে না সৃষ্টি করা হয়েছিল পানি, না আরশ, না কুরসী, না লওহ, না কলম, না বেহেশত, না দোযখ, না পর্দা, না মেঘমালা, না আদম, না হাওয়া।"

ইমাম যুরকানী মালেকী (রহ:)-এর 'শরহে মাওয়াহিব' (মাতবা'আ আল-আমিরা কায়রো সংস্করণের ১:৫৬) এবং দিয়ারবকরীর 'তারিখ আল-খামিস' (১:২০) বইগুলোর ভাষ্যানুযায়ী

ইমাম বায়হাকী (বেসাল-৪৫৮ হিজরী) ভিন্ন শব্দচয়ন দ্বারা এটি বর্ণনা করেন নিজ 'দালাইল আন-নবুওয়া' গ্রন্থে।

হুসাইন ইবনে মোহাম্মদ দিয়ারবকরী (বেসাল-৯৬৬ হিজরী) তাঁর ১০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী 'তারিখে আল-খামিস ফী আহওয়াল আনফাসি নাফিস' শীর্ষক ইতিহাসগ্রন্থে বলেন: "আল্লাহর প্রতি সমস্ত প্রশংসা, যিনি সব কিছুর আগে মহানবী (দ:)-এর নূর পয়দা করেন।" 'হাদীসটি যে কেউ পড়লেই নিশ্চিত হবেন যে এটি মিথ্যা' - আল-গুমারীর এহেন অতিরঞ্জিত মন্তব্যকে এই বক্তব্যটি নাকচ করে দেয়। অতঃপর দিয়ারবকরী হাদীসখানা দলিল হিসেবে পেশ করেন (মু'আসসাসাত শা'বান সংখ্যা, বৈরুত সংস্করণের ১:১৯)।

মোহাম্মদ ইবনে আহমদ ফাসী (ইন্তেকাল-১০৫২ হিজরী) তাঁর 'মাতালি আল-মাসাররাত' পুস্তকে (মাতবা'আ আল-তাযিয়্যা সংস্করণের ২১০, ২২১ পৃষ্ঠায়) এই হাদীস দলিল হিসেরে উদ্ধৃত করেন এবং বলেন: "এই বর্ণনাগুলো সকল সৃষ্টির ওপরে হুযূর পাক (দ:)-এর শ্রেষ্ঠত্ব (আওয়ালিয়্যা) ও অগ্রাধিকার সাব্যস্ত করে, আর এও প্রতিভাত করে যে তিনি তাদের কারণ (সাবাব)।

আব্দুল্লাহ গুমারী নিজ 'এরশাদ আত্ তালেব আল্ নাজিব ইলা মা ফী আল-মাওলিদ আন্ নাবাউয়ী মিন আল-আকাযিব' (দারুল ফুরকান সংস্করণের ৯-১২ পৃষ্ঠা) পুস্তকে ইমাম সৈয়ুতী (রহ:)-এর বক্তব্যের ওপর মন্তব্য করেন যে উপরোক্ত হাদীসের কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ নেই; তিনি বলেন, "এতে ইমাম সৈয়ুতীর পক্ষ থেকে চরম শিথিলতা দৃশ্যমান হয় , যা থেকে তাঁকে আমি ঊর্ধ্বে ভাবতাম। প্রথমতঃ এই হাদীস আবদুর রাযযাকের 'মুসান্নাফ' কেতাবে উপস্থিত নেই, অন্যান্য হাদীসের বইপত্রেও নেই। দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসের কোনো এসনাদ (বর্ণনাকারীদের পরম্পরা) নেই। তৃতীয়তঃ তিনি হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করেন নি। দিয়ারবকরীর 'তারিখ' গ্রন্থে এ কথা বলা হয়েছে এবং যে কেউ হাদীসটি পড়লেই নিশ্চিত হবেন যে এটি মহানবী (দ:) সম্পর্কে একটি মিথ্যা।" আল-গুমারীর এই অতিরঞ্জিত সিদ্ধান্ত যে নাকচ তা এই বাস্তবতা দ্বারা প্রতিভাত হয় যে দিয়ারবকরী নিজেই এটিকে মিথ্যা হিসেবে বিবেচনা করেন নি যখন তিনি তাঁর বইয়ের প্রারম্ভে হাদীসটি উদ্ধৃত করেন।

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (বেসাল-৫৬১ হিজরী) তাঁর 'সিররুল আসরার ফী মা ইয়াহতাজু

ইলাইহ আল-আবরার' (লাহোর সংস্করণের পৃষ্ঠা ১২-১৪) কেতাবে এর উদ্ধৃতি দেন।

আলী ইবনে বুরহান আল-দ্বীন আল-হালাবী (ইনতেকাল-১০৪৪ হিজরী) নিজ 'সীরাহ' (মাকতাবা ইসলামিয়্যা বৈরুত সংস্করণের ১:৩১) পুস্তকে এ হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন এবং এরপর বলেন, "(সৃষ্টিতে) যা কিছু অস্তিত্বশীল, মহানবী (দ:) যে সবার মূল এ হাদীস তাই প্রমাণ করে; আর আল্লাহ-ই সবচেয়ে ভাল জানেন।"

ইসমাইল হাক্কী (ইন্তেকাল-১১৩৭ হিজরী) তাঁর 'তাফসীরে রুহুল বয়ান' শীর্ষক কেতাবে এই হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন এবং বলেন: "জেনে রাখুন, ওহে জ্ঞানী-গুণীজন, আল্লাহ সর্বপ্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেন, তা আপনাদের মহানবী (দ:)-এর নূর.....আর তিনিই হলেন সকল সৃষ্টির অস্তিত্বশীল হবার কারণ এবং তাদের সবার প্রতি আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে করুণা.....আর তিনি না হলে ওপরের ও নিচের জগতসমূহ সৃষ্টি করা হতো না।" ইমাম ইউসুফ নাবহানী এই হাদীসের উদ্ধৃতি দেন নিজ 'জওয়াহির আল-বিহার' গ্রন্থে (১১২৫ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী (বেসাল-১১৩৭ হিজরী) স্বরচিত 'ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়্যা' পুস্তকে (বাবা কায়রো সংস্করণের ২৪৭ পৃষ্ঠা) বলেন যে হযরত আব্দুর রাযযাক এ হাদীস বর্ণনা করেছেন; তিনি এটি মহানবী (দ:)-এর মওলিদ-বিষয়ক নিজ কাব্যগ্রন্থ 'আন-নি'মাতুল কুবরা'-এর ৩য় পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন।

মোহাম্মদ ইবনে আল-হাজ্জ আল-আবদারী (ইন্তেকাল-৭৩৬ হিজরী) নিজ 'আল-মাদখাল' কেতাবে (দারুল কিতাব আল-আরবী বৈরুত সংস্করণের ২:৩৪) আল-খতিব আবু আল-রাবি' মুহাম্মদ ইবনে আল-লায়েস প্রণীত 'শেফা আস্ সুদূর' গ্রন্থ হতে এর উদ্ধৃতি দেন, যা'তে আল-লায়েস বলেন, "আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন তা মহানবী (দ:)-এর নূর; আর ওই নূর অস্তিত্ব পেয়েই আল্লাহর প্রতি সেজদা করেন। আল্লাহ ওই নূরকে চার ভাগে বিভক্ত করেন এবং ওর প্রথম অংশ দ্বারা আরশ, দ্বিতীয়টি দ্বারা কলম, তৃতীয়টি দ্বারা লওহ এবং চতুর্থটি খন্ডিত করে বাকি সৃষ্টি জগতকে অস্তিত্ব দেন। অতএব, আরশের নূর সৃষ্ট হয়েছে রাসূলে পাক (দ:)-এর নূর থেকে; কলমের নূরও তাঁর নূর থেকে; লওহের নূরও তাঁর নূর থেকে; দিনের আলো, জ্ঞানের আলো, সূর্য ও চাঁদের আলো, এবং দৃষ্টিশক্তি ও দূরদৃষ্টি সবই তাঁর নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

ভারত উপমহাদেশের ওহাবী-প্রভাবিত দেওবন্দী মতবাদের গুরুদের অন্যতম শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল দেহেলভী নিজ 'এক রওযাহ' শীর্ষক চটি পুস্তিকায় (মালটা সংস্করণের ১১ পৃষ্ঠা) লিখেছে: "বর্ণনার ইশারা অনুযায়ী, 'আল্লাহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন আমার (হুযূরের) নূর'।"

সোলায়মান জামাল (ইনতেকাল-১২০৪ হিজরী) ইমাম বুসিরী (রহ:)-এর ওপর কৃত তাঁর ব্যাখ্যামূলক কেতাব 'আল-ফুতুহাত আল-আহমদিয়্যা বি আল-মিনাহ আল-মোহাম্মদিয়্যা' (হেজাযী কায়রো সংস্করণের ৬ পৃষ্ঠা)-এ এই হাদীস দলিল হিসেবে উদ্ধৃত করেন।

ভারত উপমহাদেশের দেওবন্দী ওহাবী গুরুদের অন্যতম রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী তার কৃত 'ফতোওয়ায়ে রশীদিয়্যা' পুস্তকে (করাচী সংস্করণের ১৫৭ পৃষ্ঠায়) লিখেছে যে এই হাদীস "নির্ভরযোগ্য সংকলনগুলোতে পাওয়া যায় নি, তবে শায়খ আবদুল হক্ক দেহেলভী এর কিছু প্রামাণ্য ভিত্তি থাকায় একে উদ্ধৃত করেছেন।" আসলে শায়খ আবদুল হক্ক দেহেলেভী (রহ:) শুধু এর উদ্ধৃতি-ই দেন নি, তিনি আরও বলেছেন যে এই হাদীস সহীহ (নির্ভুল)।

আবদুল করীম জিলি নিজ 'নামুস আল-আ'যম ওয়া আল-কামুস আল-আকদাম ফী মা'রেফত কদর আল-বানী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' গ্রন্থে এই হাদীসের উদ্ধৃতি দেন। ইমাম নাবহানী (রহ:)-ও এটি বর্ণনা করেন তাঁর 'জওয়াহির আল-বিহার' কেতাবে।

উমর ইবনে আহমদ খারপুতী (ইনতেকাল-১২৯৯ হিজরী) ইমাম বুসিরী (রহ:)-এর ওপর কৃত নিজ ব্যাখ্যামূলক 'শরহে কাসিদাত আল-বুরদা' বইয়ে (করাচী সংস্করণের ৭৩ পৃষ্ঠায়) এর উদ্ধৃতি দেন।

শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আলাউয়ী মালেকী আল-হাসানী (রহ:) মোল্লা আলী কারীর মীলাদ-বিষয়ক পুস্তকের ওপর লেখা নিজ ব্যাখ্যামূলক 'হাশিয়াত আল-মাওলিদ আল-রাওয়ী ফী আল-মাওলিদ আল-নববী' (পৃষ্ঠা ৪০) শীর্ষক কেতাবে বলেন, "হযরত জাবের (রা:)-এর সনদ প্রশ্নাতীত, তবে উলামা-এ-কেরাম এই হাদীসের মূল অংশের স্বাতন্ত্র্যের কারণে এতে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম বায়হাকী (রহ:) কিছু ভিন্নতাসহ এই হাদীস বর্ণনা করেন।" অতঃপর

শায়খ আলাউয়ী মালেকী (রহ:) এ রকম বেশ কিছু বর্ণনা পেশ করে মহানবী (দ:)-এর নূর হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেন।

ইমাম ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল নাবহানী (রহ:) তাঁর প্রণীত 'আল-আনওয়ার আল-মোহাম্মদিয়্যা (পৃষ্ঠা ১৩), 'জওয়াহির আল-বিহার' (বাবা কায়রো সংস্করণ, ১১২৫ বা ৪:২২০ পৃষ্ঠা) এবং 'হুজ্জাত-আল্লাহ আলাল আলামীন' (২৮ পৃষ্ঠা) বইগুলোতে এ হাদীসের উদ্ধৃতি দেন।

মওলানা আবদুল গনী নাবলুসী (বেসাল-১১৪৩ হিজরী) নিজ 'হাদিকাতুন্ নদীয়া' (মাকতাবা আল-নূরীয়্যা, ফয়সালাবাদ সংস্করণের ২:৩৭৫) কেতাবে বলেন, "মহানবী (দ:) সবার জন্যে সর্বজনীন সরদার; আর কেনই বা হবেন না - যখন সমস্ত সৃষ্টি-ই তাঁর নূর থেকে সৃষ্ট, যা (আলোচ্য) সহীহ হাদীসে বিবৃত হয়েছে।"

হযরত নিযামউদ্দীন ইবনে হাসান নিশাপুরী (বেসাল-৭২৮ হিজরী) স্বরচিত 'গারাইব আল-কুরআন' শীর্ষক তাফসীরগ্রন্থে (কায়রোর বাবা সংস্করণের ৮:৬৬) "এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি-ই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করি (অর্থাৎ, প্রথম মুসলমান হই)" - কুরআন মজীদের এই আয়াতের (৩৯:১২) ব্যাখ্যাকালে হাদীসটির উদ্ধৃতি দেন।

মোল্লা আলী ইবনে সুলতান আল-কারী (ইনতেকাল-১০১৪ হিজরী) নিজ 'আল-মাওলিদ আল-রাওয়ী ফী আল-মাওলিদ আল-নববী' (পৃষ্ঠা ৪০) পুস্তকে পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন; এ বইটি শায়খ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলাউয়ী আল-মালেকী সম্পাদনা করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে মোহাম্মদ কসতলানী (বেসাল-৯২৩ হিজরী) তাঁর প্রণীত 'আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে এই হাদীস বর্ণনা করেন (ইমাম যুরকানী মালেকীর ব্যাখ্যাসম্বলিত কেতাবের ১:৫৫)।

শায়খ ইউসুফ আল-সাইয়্যেদ হাশিম আল-রেফাঈ' তাঁর কৃত 'আদিল্লাত আহল আস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আ আল-মুসাম্মা আল-রাদ্দ আল-মোহকাম আল-মানী' শীর্ষক পুস্তকে (২২ পৃষ্ঠায়) এর হাওয়ালা দেন এবং বলেন, "আবদুর রাযযাক এটি বর্ণনা করেছেন।"

ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) নিজ 'আল-হাওল লি আল-ফাতাউয়ী' কেতাবে সূরা মুদাসসির ব্যাখ্যাকালে বলেন, "এর কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ নেই"; তাঁর 'তাখরিজ আহাদিস শরহ আল-মাওয়াকিফ' গ্রন্থে তিনি আরও বলেন, "আমি এই শব্দচয়নে বর্ণনাটি পাই নি।"

ভারত উপমহাদেশের দেওবন্দী ওহাবীদের নেতা আশরাফ আলী থানভী স্বরচিত 'নশরুত্ তৈয়ব' (উর্দুতে লাহোর সংস্করণের ৬ এবং ২১৫ পৃষ্ঠা) পুস্তকে এই হাদীস আবদুর রাযযাকের সূত্রে বর্ণনা করে এবং এটাকে নির্ভরযোগ্য বলে।

ইমাম যুরকানী মালেকী নিজ 'শরহে মাওয়াহিব' কেতাবে (মাতবা'আ আল-আমিরা, কায়রো সংস্করণের ১:৫৬) এই হাদীসের উদ্ধৃতি দেন এবং একে আবদুর রাযযাকের 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে বর্ণিত বলে জানান।

ভারত উপমহাদেশের দেওবন্দী ওহাবীদের নেতা এহসান এলাহী যাহির, যাকে লাহোরের সুন্নীভিত্তিক বেরেলভী সিলসিলা শত্রু হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে, সে তার 'হাদিয়্যাত আল-মাহদী' (শিয়ালকোট সংস্করণের ৫৬ পৃষ্ঠা) বইয়ে বলে: "আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি আরম্ভ করেন 'আল-নূর আল-মোহাম্মদিয়া' তথা মহানবী (দ:)-এর নূর দ্বারা; অতঃপর তিনি আরশ সৃষ্টি করেন পানির ওপর; এরপর বাতাস এবং একে একে 'নূন', 'কলম', লওহ এবং মস্তিষ্ক সৃষ্টি করেন। অতএব, মহানবী (দ:)-এর নূর আসমান ও জমিনে যা কিছু বিরাজমান তা সৃষ্টিতে মৌলিক উপাদান বলে সাব্যস্ত হয়.....আর হাদীসে আমাদের কাছে যা বিবৃত হয়েছে, তাতে (বোঝা যায়) আল্লাহতা'লা প্রথমে কলম সৃষ্টি করেন; আরও প্রথমে সৃষ্টি করেন মস্তিষ্ক; এর দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে তা হলো আপেক্ষিক বা তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব।"

মহানবী (দ:)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার ও সাথীদের প্রতিও শান্তি ও খোদায়ী আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

---ড: জি, এফ, হাদ্দাদ